বিরুদ্ধবাদীদের সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

ড. মোঃ আবদুল কাদের

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2012 - 1433

IslamHouse.com

تعامل النبي محمد ﷺ مع مخالفيه

« باللغة البنغالية »

د/ محمد عبد القادر

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2012 - 1433

IslamHouse.com

বিরুদ্ধবাদীদের সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

ইসলামী দা‘ওয়াতের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় বরং কণ্টকাকীর্ণ। হক ও বাতিলের মাঝে দ্বন্দ্ব চিরন্তন ও সতত। বাতিল পন্থী ও শয়তানের অনুসারীদের স্বভাব হলো সত্যপন্থীদের উপর অত্যাচার, অবিচার ও নির্যাতন করা। দা‘ঈর ব্যাপারে তাদের ভূমিকা অধিক কঠোর ও নির্লজ্জ ছিল। তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়, আর আল্লাহ স্বীয় নূরকে পরিপূর্ণতা দিতে চান।[1] তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতী মিশনকে দুর্বল করে দেয়ার জন্য বিভিন্ন কুট-কৌশলের পঁয়তারা করে। মুসলিমদের মনোবল নষ্ট করার নিমিত্ত্বে দা‘ঈকে (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালামকে) মিথ্যাবাদী, পথভ্রষ্ট, জাদুকর, পাগল, হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপের বস্তু, অলীক ধারণাপ্রসূত জ্ঞানের অধিকারী প্রভৃতি আখ্যা দেয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ ও

---

1 ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطۡفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفۡوَٰهِهِمۡ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡكَٰفِرُونَ ٨ ﴾ [الصف: ٨] আল-কুরআন, সূরা আছ ছফ : ৮।

সংশয় সৃষ্টি করে।[2] শুধু তাই নয়, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেশ ত্যাগের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছেঃ

---

[2] তারা দা'ঈর ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন অপবাদে লিপ্ত হয়। যেমন: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন পাগল। কুরআনে এসেছে,

﴿وَقَالُواْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيۡهِ ٱلذِّكۡرُ إِنَّكَ لَمَجۡنُونٞ ٦﴾ [الحجر: ٦]

"ওসব কাফেররা বললো, যার উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, নিশ্চয়ই সে একটা পাগল।" সূরা আল-হিজর : ৬।

কখনো কখনো তাঁর উপর জাদুকর ও মিথ্যাবাদী হওয়ার অপবাদ দেয়া হতো, যেমন কুরআনে এসেছে,

﴿وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٞ مِّنۡهُمۡۖ وَقَالَ ٱلۡكَٰفِرُونَ هَٰذَا سَٰحِرٞ كَذَّابٌ ٤﴾ [ص: ٤]

"তারা বিস্ময়বোধ করে যে, তাদেরই কাছে তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। আর কাফেররা বলে, এ-তো এক মিথ্যাচারী জাদুকর।" সূরা ছোয়াদ : ৪।

এ ছাড়াও এ কুরআনকে তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্ভাবনকৃত ও অলীক কাহিনী গ্রন্থ বলে আখ্যা দিত।

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّآ إِفۡكٌ ٱفۡتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيۡهِ قَوۡمٌ ءَاخَرُونَۖ فَقَدۡ جَآءُو ظُلۡمٗا وَزُورٗا ٤ وَقَالُوٓاْ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٱكۡتَتَبَهَا فَهِيَ تُمۡلَىٰ عَلَيۡهِ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلٗا ٥﴾ [الفرقان: ٤، ٥]

"কাফেররা বলে, এটা মিথ্যা বৈ কিছু নয়,যা তিনি উদ্ভাবন করেছেন এবং অন্য লোকেরা তাঁকে সাহায্য করেছে। অবশ্যই তারা অবিচার ও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। তারা বলে,এগুলোতো পুরাকালের রূপকথা,যা তিনি লিখে রেখেছেন। এ গুলো সকাল-সন্ধায় তাঁর কাছে পাঠ করা হয়।" সূরা ফুরকান : ৪-৫।

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمۡ لَنُخۡرِجَنَّكُم مِّنۡ أَرۡضِنَآ أَوۡ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاۖ فَأَوۡحَىٰٓ إِلَيۡهِمۡ رَبُّهُمۡ لَنُهۡلِكَنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٣ ﴾ [ابراهيم: ١٣]

"কাফেররা রাসূলগণকে বলেছিল: আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেব অথবা তোমরা আমাদের মতাদর্শে ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী পাঠালেন যে, আমি যালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব।"[3]

এরূপে তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসারীদেরকে দেশত্যাগের হুমকি দিতে থাকে। সূরা আল-কাসাসে তাদের বক্তব্য নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা হয়েছেঃ

﴿ وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلۡهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفۡ مِنۡ أَرۡضِنَآۚ أَوَ لَمۡ نُمَكِّن لَّهُمۡ حَرَمًا ءَامِنًا يُجۡبَىٰٓ إِلَيۡهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَيۡءٖ رِّزۡقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ٥٧ ﴾ [القصص: ٥٧]

"তারা বলে, আমরা যদি আপনার সাথে সৎপথ অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে দেশ হতে উৎখাত করবে। আমি কি তাদেরকে এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করি নি? যেখানে সর্বপ্রকার

---

[3] আল-কুরআন, সুরা ইবরাহীম : ১৩।

ফলমূল আমদানী হয়, আমার দেয়া রিযিকস্বরূপ। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এ বিষয়ে অবগত নয়।”[4]

এক পর্যায়ে তারা চেষ্টা করেছিল যে, ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন রচনা করবে। অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে কিছু ছাড় দিবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৌত্তলিকদের কিছু গ্রহণ করবেন এবং পৌত্তলিকরাও রাসূলের কিছু আদর্শ গ্রহণ করবে।[5]

ইবন জারীর এবং তিবরানীর একটি বর্ণনায় এসেছে, পৌত্তলিকরা এ মর্মে প্রস্তাব দিল যে, একবছর আপনি আমাদের উপস্যদের উপাসনা করুন, আর এক বছর আমরা আপনার প্রভূর উপাসনা করব। আবদ ইবন হোমায়েদের বর্ণনায় আরও উল্লেখ রয়েছে যে,

---

[4] আল-কুরআন, সূরা আল-কাসাস : ৫৭।

[5] আল্লাহ তা‘আলা পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলেন

﴿ وَدُّواْ لَوۡ تُدۡهِنُ فَيُدۡهِنُونَ ۝٩ ﴾ [القلم: ٩]

“ওরা চায় যে, আপনি নমনীয় হবেন, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।” আল-কুরআন, সূরা কলম : ৯।

পৌত্তলিকরা বলল, আপনি যদি আমাদের উপাস্যদের মেনে নেন, তবে আমরাও আপনার প্রভুর ইবাদত করবো।[6]

ইসলামী দা'ওয়াত প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে দা'ঈর উপর অন্যায়, অবিচার, যুলুম-নির্যাতন আসা দা'ওয়াতী পথের প্রকৃত স্বভাবের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অতএব, দা'ঈর উপর যুলুম আসাটা খুবই স্বাভাবিক। ইসলামের পন্ডিতবর্গও বিষয়টি বিভিন্ন দিক দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, "ইসলামী দা'ওয়াত যে নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত করে তা হলো : তারা তাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে, তা থেকে দূরে থাকে এবং সে ধর্মকে কুফর ও ভ্রান্ত হিসেবে আখ্যা দেয়। আর এগুলো তাদের অন্তরসমুহে বিষাক্ত গন্ডগোল সৃষ্টি করে হৃদয় বক্ষসমুহে হিংস্রতা উসকে দেয়। এ অবস্থায় হকপন্থী অধিকাংশ শ্রোতা হকের দা'ঈকে বারণ করতে উদ্যত হয়। আর এটি প্রথমতঃ কখনো

[6] আল্লামা শাওকানী, *ফতহুল কাদীর*, ৫ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৮।

হত্যার মাধ্যমে দ্বিতীয়তঃ কখনো মারধর করার মাধ্যমে তৃতীয়তঃ কখনো গালমন্দ বলার মাধ্যমে হয়ে থাকে।[7]

আল্লামা বায়দাভী বলেন, এ দা'ওয়াত অবশ্যই ঐ ধরনের (যুলুম, অত্যাচারমূলক) তৎপরতা থেকে প্রায়ই মুক্ত থাকে না এ কারণে যে, এ দা'ওয়াতে অন্তর্ভুক্ত থাকে (পূর্ববর্তী) আদত-অভ্যাস সমূহ বর্জন করা, প্রবৃত্তির তাড়নাসমূহ পরিত্যাগ করা, পূর্বসূরীদের ধর্মের নিন্দা করা এবং তাদেরকে কুফরী ও গোমরাহীতে আখ্যায়িত করা।[8]

অতএব, তৎকালীন সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাওয়াতকে প্রতিরোধ করার কারণসমূহকে আমরা নিম্নোক্ত ভাবে নির্দিষ্ট করতে পারি।

(ক) পূর্বপুরুষদের ধর্মের অন্ধ অনুকরণ প্রবণতা ;

(খ) নিজস্ব মত ও পথের প্রতি আসক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ ;

---

[7] ইমাম ফখরুদ্দিন আর-রাযী ,*আত্ তাফসীরুল কবীর,* ১৯শ খন্ড, (মিসর: দারু ইহ্ইয়ইত্-তুরাছিল-'আরাবী, তা.বি.), পৃ. ১৩৮।

[8] কাযী নাসিরুদ্দীন বায়দাভী, *আনওয়ারুত্ তানযীল ওয়া আসরারুত্ -তা'বীল,* (দামেশক; দারুল ফিকর তা.বি.), পৃ. ৩৬৯।

(গ) সামাজিক কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি হারানোর আশংকা ;

(ঘ) শয়তানের ষড়যন্ত্র ;

দা'ঈ অত্যাচার নির্যাতনের মোকাবিলায় প্রতিশাধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে সে ক্ষেত্রে সীমালংঘন করা যাবে না। যে পরিমাণ নির্যাতন করা হয়েছে সে পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশ হল,

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦۖ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِينَ ١٢٦﴾ [النحل: ١٢٦]

"আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদের কষ্ট দেয়া হয়। যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্য উত্তম।"[9]

আলাচ্য আয়াতে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ধৈর্য ধারণকেই মঙ্গলজনক বলা হয়েছে। ফলে বাহ্যত প্রতিরোধের কোনো প্রয়োজন নেই, নেই এর কোনো উপযোগিতা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে সবর বলতে নীরবে সহ্য করাকে বুঝানো হয় নি, বরং

[9] আল-কুরআন, সূরা আন-নহল : ১২৬।

‘সবর’ মানে প্রতিরোধের প্রস্তুতি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষায় সংযম প্রদর্শন করা মাত্র। কেননা, অত্যাচারীকে তার অত্যাচার হতে নিবৃত করার জন্য জিহাদকে অত্যাবশ্যক করে দেয়া হয়েছে। যুলুমের প্রতিবাদে প্রতিশোধ না নিয়ে যদি শুধু ধৈর্যধারণ করা হয় তাহলে তা আল্লাহর বিধান জিহাদ এর সাথে অসংগতি দেখা দিবে। আল্লাহ তা‘আলা যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয়ের মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ ﴾ [الانفال: ٦٠]

“তাদের মোকাবিলায় যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ কর।”[10]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন দা‘ঈ। তিনি মানুষদের আল্লাহর পথে আহবান জানানোর জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, প্রতিশোধ নেবার জন্য নয়। তাঁর মূল লক্ষ্য দা‘ওয়াতে সফল হওয়া, প্রতিশোধ নেয়া নয়। বিধায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরুদ্ধবাদীদের ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতা মোকাবিলায় বিভিন্ন ধরনের কৌশল ও মাধ্যম অবলম্বন করেছেন, যা পূর্ববর্তী

---

[10] আল-কুরআন, সূরা আল-আনফাল : ৬০।

নবী-রাসূলদের অভিজ্ঞতালব্দ জ্ঞান ও বাস্তবতার নিরিখে নির্ণীত হয়েছে। নিম্নে সেগুলো প্রদত্ত হলো:

(ক) ধৈর্য ও সংযম অবলম্বন

ধৈর্য ও সংযমকে আরবীতে ‘সবর’ বলা হয়। এটা দু’ধরনের হতে পারে।

এক. সৎকর্ম সম্পদনের বিষয়ে ধৈর্যধারণ।

দুই. অসৎকর্ম হতে বিরত থাকা।

ইসলামী দা‘ওয়াতের ক্ষেত্রে ‘সবর’ এর গুরুত্ব অপরিসীম। একে দা‘ওয়াতের মেরুদন্ড বললেও অত্যুক্তি হবে না। যুলুম নির্যাতন প্রতিরোধে ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শন একটি বিরাট অস্ত্র। মাযলুম ব্যক্তি যখন নির্যাতিত হবার পরও সবর ইখতিয়ার করে, তখন জালেমের অন্তর (আত্মা) অনেক সময় কেঁপে উঠে ও হৃদয় বিগলিত হয়। অপরদিকে সাধারণ মানুষও মাযলুমের প্রতি সমবেদনা অনুভব করতে থাকে। ফলে, সাধারণ জনমত স্বভাবতঃ (মাযলুমের) তার পক্ষে থাকে। একজন দা‘ঈ মাযলুম হবার পর ধৈর্য ও সংযম অবলম্বনের মাধ্যমে সাধারণ জনমতকে তার পক্ষে

নিতে সক্ষম হয়। বিধায়, তার দা'ওয়াতে সাধারণ মানুষের মাঝে ইতিবাচক সাড়া পড়ে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতে ইসলামী দা'ওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বদা ধৈর্য অবলম্বনের পন্থা অবলম্বন করেছেন। কোনভাবেই প্রতিরোধের চেষ্টা করেন নি। এতে করে সাধারণ মানুষের নিকট ইসলামী দা'ওয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। মানুষ বুঝতে পারে যে, এ দা'ওয়াতে কারো ব্যক্তিগত কোনো উদ্দেশ্য নেই। এটি মানুষের কল্যাণ সাধনে পরিচালিত হয়। এজন্য সাধারণতঃ প্রতিশোধ না নিয়ে যথাসম্ভব ধৈর্য ধরার জন্য আল-কুরআনে অনেকবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

﴿ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهۡجُرۡهُمۡ هَجۡرٗا جَمِيلٗا ١٠ ﴾ [المزمل: ١٠]

"আর লোকেরা যে সব কথাবার্তা রচনা করে বেড়াচ্ছে, সে জন্যে আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং সৌজন্য রক্ষা করে তাদের থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যান।"[11]

[11] আল-কুরআন, সূরা মুয্যাম্মিল : ১০।

দা'ওয়াতের কণ্টকাকীর্ণ পথে ধৈর্য ছাড়া টিকে থাকা খুবই অসম্ভব। এ কাজে বিভিন্ন মেযাজের লোকদের সাথে মিশতে হয়, শুনতে হয় বিভিন্ন ধরনের কটুকথা, হাসি-ঠাট্টা-বিদ্রূপ। সর্বদা প্রতিশোধ স্পৃহা নিয়ে কাজ করলে দা'ওয়াতের কাজে ব্যাঘাত হবে। আল্লাহ তা'আলা এগুলোর মাধ্যমে দা'ঈদের পরীক্ষা করে থাকেন। সুতরাং এটি এক প্রকারের জিহাদও বটে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ ۞لَتُبۡلَوُنَّ فِيٓ أَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ وَلَتَسۡمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوٓاْ أَذٗى كَثِيرٗاۚ وَإِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ١٨٦ ﴾ [ال عمران: ١٨٦]

"অবশ্যই অবশ্যই ধন সম্পদে এবং জন-সম্পদে তোমাদের পরীক্ষা করা হবে এবং অবশ্য তোমরা পূর্ববর্তী আহলে কিতাব ও মুশরিকদের কাছ থেকে বহু অশোভন উক্তি শুনবে। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর তবে তা হবে একান্ত সাহসের ব্যাপার।"[12]

[12] আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান : ১৬৮।

ধৈর্য মানুষকে দীনের পথে অটল ও অবিচল টিকে থাকতে সহায়তা করে। যুগে যুগে সকল নবী-রাসূলকে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সকলেই সর্বোচ্চ ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে অজস্র নির্যাতনের মুখেও তারা আদর্শ বিচ্যুত হয়ে অত্যাচারীর মত গ্রহণ করেন নি। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছেঃ

﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٤٦ ﴾ [ال عمران: ١٤٦]

"এমন অনেক নবী ছিলেন, যাদের সঙ্গী-সাথীরা তাদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে, তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে। কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরে যায় নি, ক্লান্তও হয় নি এবং দমেও যায়নি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।"[13]

এ পথে চলতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পাগল, মিথ্যুক, গণক, জাদুকর ইত্যাদি ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ কটুকথা সহ্য করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, শারিরীক নির্যাতনও ভোগ করতে হয়েছে। কখনো তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। তাঁর

---

13 আল-কুরআন, সূরা আল-ইমরান : ১৬৮।

সামনে তাঁর অনুসারীদের উপর চড়ানো হয়েছে ভয়াবহ নির্যাতন ও অত্যাচারের স্ট্রীমরোলার। বিলাল, খাববাব, সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ নির্যাতিত মুসলিমদের ঘটনা সর্বজনবিদিত। তবুও তিনি ধৈর্যচ্যুত হন নি, বরং তাঁর সাথীদের পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের উপর অর্পিত নির্যাতনের কাহিনী শুনিয়ে অভয় দিয়েছেন।[14] মূলতঃ

---

[14] খাববাব রাদিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমদের উপর অত্যাচারের অবস্থা দেখে বলেনঃ

شكونا الي رسول و هو متوسد بردة له في ظل الكعبة قلنا الاتنتصر لنا الا تدعو الله لنا قال كان الرجل فيمن قبلكم يحفرله في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع علي رأسه فيشق بإثنين و ما يصده عن دينه و يمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب و ما يصده ذلك عن دينه و الله ليتمن هذا الأمر حتي يسير الراكب من صنعاء إلي حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب علي غنمه و لكنكم تستعجلون .

“খাববাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট মক্কার কাফেরদের বিরোধিতার ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। তিনি তখন চাদর মাথার নীচে রেখে কা‘বার ছায়ায় শুয়েছিলেন। আমরা তাঁকে বললাম : আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইবেন না? তাঁর কাছে আমাদের জন্য দো‘আ করবেন না ? তিনি বললেন: তোমাদের পূর্বেও অনেক মানুষকে ধরে নিয়ে মাটিতে গর্ত করে তাতে দাঁড় করানো হতো, কাউকে লোহার চিরুণী দিয়ে শরীরের গোশত ও হাড় আচড়িয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হতো, তবুও কোনো কিছু তাকে তার দীন থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে নি। আল্লাহর শপথ ! এ দীনকে আল্লাহ অবশ্যই পূর্ণ করে দিবেন। এমনকি

এ ধৈর্য ও সহনশীলতার ভিত্তি ছিল আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত,

﴿ فَٱصۡبِرۡ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ٣٥ ﴾ [الاحقاف: ٣٥]

"তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন ধৈর্য ধারণ করেছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।"[15]

খ. আল্লাহ তা'আলার স্মরণ ও ইবাদতে মশগুল হওয়া

মক্কবাসীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দা'ওয়াতকে প্রতিহত করার জন্যে তাঁকে বিভিন্ন অপবাদে অভিহিত করেছিল। কেউ জাদুকর, কেউ কবি এবং মিথ্যাবাদী বলত। তাদের এ সকল পীড়াদায়ক ও মর্মন্তুদ আচরণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ব্যথিত হতেন এবং ধৈর্যের মাধ্যমে সেগুলোর প্রতিকার করতেন। এক্ষেত্রে তিনি সর্বদা আল্লাহ রাববুল

সেসময় আসবে যখন একজন পথচারী সান'আ থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত চলে যাবে, অথচ সে আল্লাহ, আর নিজের মেষ পালের জন্য নেকড়ে বাঘ ছাড়া আর কিছু ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা বড্ড্ তাড়াহুড়া করছো। (ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৬১২।)

[15] আল-কুরআন, সূরা আল-আহকাফ : ৩৫।

আলামীনের স্মরণে নিজেকে ব্যাস্ত রাখতেন এবং ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকতেন। কেননা, মহান আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করলে মনে এ ধ্যাণ-ধারণার সৃষ্টি হয় যে, এ জগতে আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত কেউ কারও কোনো রকম ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন করতে পারে না। অপরদিকে শত্রুর মোকাবিলায় প্রতিশোধ স্পৃহা যতই থাকুক না কেন তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা শক্তিশলী-বিরাট ও প্রভাবশালীর দ্বারাও অসম্ভব। সেক্ষেত্রে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হলে তা শান্তি ও সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন নির্বাহে সহায়ক হয়। এ দিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ فَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّمۡسِ وَقَبۡلَ غُرُوبِهَاۖ وَمِنۡ ءَانَآيِٕ ٱلَّيۡلِ فَسَبِّحۡ وَأَطۡرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرۡضَىٰ ١٣٠ ﴾ [طه: ١٣٠]

“সুতরাং এরা যা বলে সে বিষয়ে ধৈর্য ধারণ করুন এবং আপনার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের পূর্বে, সুর্যাস্তের পূর্বে, রাত্রির কিছু অংশ এবং দিবাভাগে সম্ভবতঃ তাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন।”[16]

---

[16] আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা : ১৩০।

আলোচ্য আয়াতে (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ) এর অর্থ যিকির ও হামদও হতে পারে। তবে এখানে বিশেষভাবে নামাযকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। “সূর্যোদয়ের পূর্বে” বলে ফজরের নামায, “সূর্যোস্তের পূর্বে” বলে যোহর ও আসরের নামায এবং “রাত্রিকালীণ নামায” বলে মাগরিব, এশা ও তাহাজ্জুদকে বুঝানো হয়েছে।[17]

খ. মন্দের জবাব ভাল ও উত্তমভাবে দেয়া

উত্তম ব্যবহার মানুষের উন্নত চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। মন্দ আচরণের বিপরীতে ভাল আচরণ করলে মানুষ সে দা‘ঈর প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনে এটি সর্বাধিক প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি ছিলেন অনুগ্রহ ও কোমলতার মূর্ত প্রতীক। তাঁর সাথে যে বাড়াবাড়ি করতো, তাকে তিনি ক্ষমা করে দিতেন। যারা তার রক্ত ঝরিয়েছে তাদের জন্য তিনি দো‘আ করেছেন। তায়েফের যমীনে আঘাতপ্রাপ্ত হবার পরও তিনি তাদের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেছিলেন।[18] যে তাঁর সাথে নিকৃষ্ট আচরণ করতো তিনি তার সাথে উৎকৃষ্ট আচরণ করতেন।

---

[17] মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭০।

[18] ইমাম বুখারী, *প্রাগুক্ত*, ১ম খন্ড, কিতাবু কাইফা বাদউল খালক, পৃ. ৪৫৮।

এদিক থেকে তাঁর সীরাত ছিল কুরআনের বাস্তব নমুনা। আল্লাহ বলেন “হে নবী ! নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন করুন।”[19] ভাল আচরণ দ্বারা শত্রুকেও বন্ধুতে পরিণত করা যায়। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَلَا تَسْتَوِي ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ ﴾ [فصلت: ٣٤]

“ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দের ব্যাপারে যা উৎকৃষ্ট তাই বলুন, তখন দেখবেন আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু।”[20]

দা‘ঈর পক্ষ থেকে মন্দ আচরণ মাদ‘উ ও দা‘ঈর মাঝে দুরত্ব বাড়িয়ে দেয়, ফলে দা‘ওয়াহ’র লক্ষ্য ব্যাহত হয়। মন্দের প্রতিশোধ নিয়ে মানুষের বাহ্য সমর্থন নেয়া যায়, অন্তর জয় করা যায় না। একমাত্র ভাল আচরণের মাধ্যমেই মানুষের অন্তরে স্থান করে নেয়া সম্ভব। এজন্যে যথাসম্ভব মন্দ আচরণকারীকে ক্ষমা করে দিয়ে

---

[19] আল-কুরআন, সূরা আল-আ‘রাফ : ১৯৯।

[20] আল-কুরআন, সূরা ফুচ্ছিলাত : ৩৪।

তাকে সংশোধনের চেষ্টা অব্যাহত রাখলে আল্লাহ তা‘আলা খুশী হন। তিনি দা‘ঈকে এর উত্তম প্রতিফল দান করেন।[21] এ ছাড়াও মহান আল্লাহ সেসব মু‘মিনদের দ্বিগুণ সওয়াব ঘোষণা করেছেন, যারা অহেতুক ও বাজে বিতর্ক থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে দা‘ওয়াতের মহান কাজ আঞ্জাম দেয়। ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু দা‘ঈর গুণাবলী বর্ণনায় সূরা আল-কাসাসে বলা হয়েছেঃ

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ ۝٥٤ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَٰلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَٰلُكُمْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَٰهِلِينَ ۝٥٥ ﴾ [القصص: ٥٤، ٥٥]

“তারা দুইবার পুরস্কৃত হবে তাদের সবরের কারণে। তারা মন্দের জবাবে ভাল করে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। তারা যখন অবাঞ্ছিত বাজে কথা-বার্তা শ্রবণ করে, তখন

---

[21] ইরশাদ হয়েছে

﴿وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثْلُهَاۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ۝٤٠﴾ [الشورى: ٤٠]

“আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। যে ক্ষমা করে ও আপোস করে, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না।” আল-কুরআন, সূরা আশ্ শূরা : ৪০।

তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, আমাদের জন্য আমাদের কাজ এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজ। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়িত হতে চাই না।"[22]

(গ) সৌজন্য বজায় রেখে বিচ্ছিন্ন হওয়া

চরম ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শন করার পরও যালিমের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকলে দা'ঈকে তাদের থেকে সাময়িকভাবে দুরত্বে অবস্থান করাই শ্রেয়। তবে এক্ষত্রে শত্রুতা প্রদর্শনের ভীতি ব্যতিরেকে সৌজন্যতা বজায় রাখার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। আল-কুরআনে একেই (হজরে জামীল) "هجر جميل" বলা হয়েছে এবং তা অবলম্বনের জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ সকল দা'ঈদের বার বার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে,

﴿ وَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهۡجُرۡهُمۡ هَجۡرٗا جَمِيلٗا ١٠ ﴾ [المزمل: ١٠]

"আর আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সৌজন্যতা বজায় রেখে তাদের পরিহার করে চলুন।"[23] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে

---

[22] আল-কুরআন, সূরা আল-কাসাস : ৫৪-৫৫।

﴿ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩ ﴾ [الاعراف: ١٩٩]

“আর জাহেল লোকদের থেকে বিরত থাকুন।”[24] অন্য স্থানে আরেকটু বাড়িয়ে বলা হয়েছে

﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا ٦٣ ﴾ [الفرقان: ٦٣]

“আর জাহেল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে আসলে, তারা বলে, ‘সালাম’।”[25]

এখানে সৌজন্যতা বজায় রেখে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা বলা হয়েছে। যেহেতু একজন দা‘ঈর কাজ হল মানুষের মাঝে দা‘ওয়াত পৌঁছে দেয়া। কিন্তু সে যদি মানুষের সাথে শত্রুতা পোষণ করে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে দা‘ওয়াতের কাজে বিঘ্ন ঘটবে। ফলে মানবিক সহমর্মিতার আচরণ অব্যাহত রেখে দা‘ওয়াতী কাজ চালু রাখা দা‘ঈর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

---

[23] আল-কুরআন, সূরা আল-মুয্যাম্মিল : ১০।

[24] আল-কুরআন, সূরা আল-আ‘রাফ : ১৯৯।

[25] আল-কুরআন, সূরা আল-ফুরকান : ৬৩।

(ঘ) বিরুদ্ধবাদীদের গণবিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা চালানো

বিরুদ্ধবাদীগণ নিজেরাই বিরোধিতায় মেতে উঠে না, বরং সাধারণ জনতাকে সে বিষয়ে প্ররোচিত করে থাকে এবং তাদের সমর্থনে বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে। অথচ সাধারণ জনতার অনেকাংশই তাদের স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয়। যদি দা'ঈগণ সাধারণ মানুষের সামনে তাদের চরিত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করে তাহলে সে সকল বিরুদ্ধবাদিরা গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। ফলে তাদের অত্যাচার নির্যাতন ও বিরোধিতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সে কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে তাদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ١٦٥ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ١٦٦ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٦٧﴾

[البقرة: ١٦٥، ١٦٧]

“আর কতইনা উত্তম হত যদি যালেমরা পার্থিব কোনো আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, আল্লাহর আযাবই সবচেয়ে কঠিন। যখন তারা তাদের অনুসারীদের সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকার করবে, আর এভাবে যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের (দুনিয়ার সাথে) সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন সে অনুসারীরা বলবে, হায়! যদি একবার দুনিয়ায় ফিরে যেতাম তাহলে আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, যেভাবে আজ তারা করছে। এভাবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম পরিতাপরূপে তাদের দেখাবেন। আর তারা জাহান্নাম হতে কখনো বের হতে পারবে না।”[26]

এ ধরনের বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে জনসাধারণকে যালিমদের বিরুদ্ধে সোচ্ছার করে তোলা যায়, অতএব, আজ যারা যালিমের সাহায্যকারী পরকাল দিবসে তাদের পরিতাপ করা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। ফলে দা‘ঈকে তা এ সকল যালিম সম্প্রদায়কে গণবিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে হবে।

---

[26] আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা : ১৬৫-১৬৭।

(ঙ) যুদ্ধ ও সশস্ত্র প্রতিরোধ

যুলুম নির্যাতন প্রতিরোধে সশস্ত্র পদক্ষেপের গুরুত্ব অত্যাধিক। ইসলামে চুড়ান্ত জিহাদ বা সশস্ত্র যুদ্ধকে যে ক'টি উদ্দেশ্যে অনুমোদন করেছে তাতে প্রাথমিক ও চুড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো, যুলুমের মূলোৎপাটন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ফেৎনা ফাসাদ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন।[27] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে-"ফেতনা ফাসাদ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও।"[28] তবে এ পর্যায়ের যুদ্ধের জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ বা নেতৃত্বের ছায়ায় হতে হবে।

তাছাড়া ইসলামের বিরোধিতায় কাফের মুশরিকগণ যখন কথায় ও কাজে চরম বাড়াবাড়ি করছে, উম্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে রাসূলের

---

[27] ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمۡ ظُلِمُواْۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصۡرِهِمۡ لَقَدِيرٌ ٣٩ ﴾ [الحج: ٣٩] "যাদেরকে যুদ্ধ বাধ্য করা হচ্ছে, তাদেরকে যুদ্ধ করতে অনুমতি দেয়া হয়েছে কারণ তারা নির্যাতিত আর আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম।" আল-কুরআন, সূরা আল-হজ্জ্ব : ৩৯।

[28] ﴿ وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِۖ فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَلَا عُدۡوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ١٩٣ ﴾ [البقرة: ١٩٣] আল-কুরআন, সূরা আনফাল : ৩৯।

দা‘ওয়াত ও আন্দোলনকে নির্মূল করার চেষ্টা করেছে, ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে, তখনও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিরক্ষামূলক বিভিন্ন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং সশস্ত্র সংগ্রাম করেছেন।

সুতরাং দু’টি কারণে ইসলামে সশস্ত্র যুদ্ধ করা যায়, এক. প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে। দুই. ইসলামী দা‘ওয়াতের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার জন্য, দাওয়াতের পথে যারা বাধা হবে, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য। তবে এখানেও মুসলিমদের ক্ষমতা ও স্বার্থ বিবেচনা করে এগুতে হবে।

বস্তুত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুদ্ধনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল সাধ্যমত জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি না ঘটিয়ে নতুন নতুন কৌশল ও নৈতিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে শত্রু শক্তি নিষ্ক্রিয় করে দেয়া। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশু ও নারী, ফলবান বৃক্ষ প্রভৃতিকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধের পূর্বে সাহাবীদের নির্দেশ দিতেন। মাত্র ২৩/২৪ জনের প্রাণ হানির মাধ্যমে তিনি মক্কা বিজয় করতে সক্ষম হন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩৩ টি যুদ্ধ ও ২৮ টি অভিযান প্রেরণ

করেছিলেন। তাঁর এ প্রতিরক্ষামূলক নীতির কারণে সেসব যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা হাজারের কোটাও স্পর্শ করে নি। পৃথিবীতে অন্যান্য যুদ্ধে হতাহতের তুলনায় যা ছিল একেবারে নগন্য। অথচ এক বিশাল ও সফল বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তিনি। যুদ্ধের ময়দানে তিনি শত্রুপক্ষকে ক্ষমা করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

(চ) সন্ধি চুক্তি করা

বিরোধীদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধের চেয়ে সন্ধি চুক্তি স্থাপনের মাধ্যমে দা'ওয়াতী কাজ আঞ্জাম দেয়া সহজ । সন্ধির ফলে উভয় পক্ষের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি-সৌহার্দ্য, মায়া-মমতা সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীতে এক পক্ষের আদর্শ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামী দা'ওয়াতকে সুশৃংখলভাবে মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিভিন্ন গোত্র ও প্রতিপক্ষের সাথে সামাজিক, রাজনৈতিক এমনকি সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর সামরিক চুক্তি ‘‘হুদায়বিয়ার সন্ধি’’ দা'ওয়াহ সম্প্রসারণে ও ইসলামের বিজয় লাভে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা

পালন করে। আর সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় দিকে থেকে মদিনা সনদ অত্যন্ত গুরুত্বের দাবীদার, যা পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানের অংশ বিশেষ হিসেবে রূপ নিয়েছিল। এ ধরনের চুক্তির মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদেরকে কাফির-মুশরিকদের অনেক অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছিলেন। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী হলো, প্রতিপক্ষ সন্ধি করতে চাইলে সন্ধি করা। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمۡ فَلَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ وَأَلۡقَوۡاْ إِلَيۡكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ عَلَيۡهِمۡ سَبِيلٗا ٩٠ ﴾ [النساء: ٩٠]

“অতএব, তারা যদি তোমাদের নিকট থেকে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে, তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে (সন্ধি ব্যতীত) অন্য কোন পথ অবলম্বনের ব্যবস্থা রখেন নি।”[29]

(ছ) প্রভাবশালীর আশ্রয় লাভ

[29] আল-কুরআন, সূরা আন্ নিসা : ৯০।

যারা প্রভাবশালী সমাজে তাদের বেশ গুরুত্ব রয়েছে। সাধারণ জনগণ প্রভাবশালীদের অনুগামী হয়ে সমাজে বসবাস করে বিধায়, প্রভাবশালী কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দীনের ছায়াতলে জামায়েত হলে সাধারণ জনগণও স্বাভাবিকভাবে দীন গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়। এজন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজের প্রভাবশালী লোকদের নিকট দা'ওয়াত উপস্থাপনের টার্গেট নির্ধারণ করেন, তাঁর দা'ওয়াতে প্রভাবশালী এক ব্যবসায়ী মহিলা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করে। অতঃপর এক পূরুষ ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ইসলামের ছায়াতলে আগমন করে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনের সর্বস্তরে প্রভাবশালীদের দা'ওয়াত দেয়ার ব্যাপারে অগ্রণী ভুমিকা পালন করেছেন। তাঁর একাধিক বিয়ের অন্যতম হিকমত হল দীন প্রচার। তাই তিনি বিভিন্ন গোত্রপতিদের কন্যাদের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। ইসলামী দা'ওয়াতের পরিভাষায় একে 'সুলতানে নাসির' বা সাহায্যকারী কর্তৃত্ব বলা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে এ ধরনের কর্তৃত্ব প্রার্থনা করেছিলেন। এ মর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছে,

﴿ وَٱجۡعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلۡطَٰنٗا نَّصِيرٗا ۝٨٠ ﴾ [الاسراء: ٨٠]

“আর আপনার পক্ষ থেকে আমার জন্য ‘সাহায্যকারী কর্তৃত্ব নিয়োগ করে দিন।”[30]

তাছাড়াও প্রভাবশালীদের ইসলাম গ্রহণের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে দো‘আ করেছেন। হাদীছে এসেছে, “হে আল্লাহ! আপনি আবু জাহল ও ওমর বিন খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণেরে মাধ্যমে তোমার দীনকে সম্মানিত ও শক্তিশালী কর।”[31] মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের চরম বিরোধিতার সময়ে দা‘ওয়াতের সংকটকালে স্বীয় চাচা আবু তালিবের আশ্রয়ে ছিলেন। তিনি মারা যাবার পর তায়েফে গিয়েছিলেন দা‘ওয়াত নিয়ে এবং সাহায্যকারী খুঁজতে। তৎকালীন মক্কার অবস্থা তার জন্য অনুকূলে ছিল না, তাই তায়েফে নিরাশ হয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন মাত‘আম ইবন আদীর আশ্রয়ে।[32]

(জ) আত্মগোপন করা

ইসলামী দা‘ওয়াতের কাজ খুবই ঝুকিপূর্ণ। এখানে দা‘ঈর উপর

---

[30] আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল : ৮০।

[31] ইমাম তিরমিযী, *প্রাগুক্ত,* কিতাবুল মানাকিব, হাদীস নং-৩৬১।

[32] ইবনুল আছির, *প্রাগুক্ত,* ২য় খন্ড, পৃ. ৯২।

যুলুম নির্যাতন আসাটা খুবই স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে কোনো রকমের প্রতিরোধ ব্যর্থ হলে আত্মগোপন করা যায়। দীনের পথে টিকে থাকতে ও যুলূম-নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য অনেক নবী-রাসূল আত্মগোপন করেছেন। যেমন যাকারিয়া আলাইহিস সালাম, ঈসা আলাইহিস সালাম, অনুরূপভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের সময় মক্কার সাওর পর্বতের গুহায়। এটা কাপুরুষতা নয় বরং পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির জন্য।

আল-কুরআনে আসহাব কাহাফের বর্ণনা থেকে তার কিছু আঁচ পাওয়া যায়। সেই গুহাবাসীদের একজনের বক্তব্য থেকে তাদের আত্মগোপনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠে, তিনি শহরের লোকদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন :

﴿ إِنَّهُمۡ إِن يَظۡهَرُواْ عَلَيۡكُمۡ يَرۡجُمُوكُمۡ أَوۡ يُعِيدُوكُمۡ فِي مِلَّتِهِمۡ ۚ ﴾ [الكهف: ٢٠]

"তারা যদি তোমাদের খবর জানতে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে দিবে।"[33]

---

[33] আল-কুরআন, সূরা কাহাফ : ২০।

(ঝ) হিজরত

কাফির-মুশরিকদের অত্যাচারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন অতিষ্ট হয়ে পড়লেন যে, তাঁর ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, অথচ প্রতিরোধের কোন কৌশল তাঁর হাতে নেই, নেই কোন আশ্রয় বা আত্মগোপন করার স্থান, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করার সংকল্প করেন। তাঁর সাহাবীগণ তাঁরই নির্দেশে হিজরত করেছিল ফেতনার দেশ থেকে নিরাপত্তার দেশ হাবশায়।[34] আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের

---

[34] উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, (তিনি হাবশায় প্রথম হিজরতকারীদের একজন) তিনি বলেন: মক্কা যখন আমাদের সংকীর্ণ হয়ে পড়ল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগন নির্যাতিত হলেন, পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন, তাঁরা তাদের ধর্মে বিপদ প্রত্যক্ষ করলেন, অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিরোধ করতে পারছেন না। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তাঁর বংশ ও চাচার হেফাজতে ছিলেন। ফলে সাহাবীগণকে যে অত্যাচার নিপীড়ন করত তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্পর্শ করতে পারত না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন : হাবশায় একজন বাদশাহ আছেন, কেউ তার কাছে নির্যাতিত হয় না। তোমরা তার রাজ্যে চলে যাও, আল্লাহ হয়ত তোমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তির কোন পথ করে দিবেন। (ইবন, হাজর আসকালানী, ফাতহুল বারী, প্রাগুক্ত, ৭ম খন্ড, প্র. ২৭৭) আমরা

নির্যাতিত অবস্থায় হিজরত করার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনে বলা হয়েছেঃ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا ۚ فَأُوْلَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ۝٩٧ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۝٩٨ فَأُوْلَٰٓئِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۝٩٩ ۞ وَمَن يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝١٠٠ ﴾ [النساء: ٩٧، ١٠٠]

“যারা নিজেরা যুলুম করে, ফেরেস্তারা তাদের প্রাণ গ্রহণের সময় বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে ? তারা বলে এ ভুখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেস্তারা তখন বলে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশ ত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে?

বিচ্ছিন্নভাবে হাবশার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম এবং সেখানে গিয়ে একত্রিত হলাম। উত্তম দেশের এক উত্তম প্রতিবেশীর ছায়ায় অবতরণ করলাম। আমরা ছিলাম আমাদের দীন নিয়ে নিরাপদে। এ নিয়ে সেখানে কোন অত্যাচারের আশংকা ছিল না। ইবন হিশাম, *আস্ সিরাত আন্ নববীয়াহ,* ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৪।

অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান, তবে যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং পথ ও পায় না আল্লাহ হয়ত তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। যে কেউ আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করে, সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করে।"[35]

শুধু তাই নয়, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বেও অনেক নবী-রাসূল হিজরত করেছেন। যেমন ইবরাহীম ও মূসা আলাইহিস সালাম। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও অনুসারীদের নিয়ে মদিনায় হিজরত করেন। তাঁর হিজরত ছিল মূলতঃ প্রস্তুতি গ্রহণ করে শক্তি সঞ্চয় করার মাধ্যমে দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে। পরবর্তীতে তিনি প্রস্তুতি নিয়ে বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন এবং দা'ওয়াতকে সফলতায় পৌঁছাতে সক্ষম হন।

[35] আল-কুরআন, সূরা আন্ নিসা : ৯৭-১০০।

(ঞ) রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ব্যবহারের প্রচেষ্টা

মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে থাকে। আর সমাজকে নিয়ন্ত্রন করে রাষ্ট্র। সমাজ জীবনে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব এক শক্তিশালী হাতিয়ার। সমাজে আদল ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন রকমের যুলুম প্রতিরোধ, সমাজ সদস্যদের মতবিরোধ নিরসন, সামাজিক সমস্যা সমাধান ও কল্যাণই তার মূল লক্ষ্য । আল্লাহ তা'আলা সকল নবী-রাসূলকে এ পরিকল্পনা দিয়েই পাঠিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [الحديد: ٢٥]

"নিশ্চয়ই আমি রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমানসহ এবং তাদের সংগে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়দন্ড, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। আমি লৌহও দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ।"[36]

আলোচ্য আয়াতে ন্যায়দন্ড ও লৌহদন্ডকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর কিতাবকে সংবিধান বলা হয়েছে। এ সবের

---

[36] আল-কুরআন, সূরা আল-হাদীদ : ২৫।

সমন্বয়ে সমাজে ইসলামী আইন চালু করে সব রকমের যুলুম অত্যাচার ও অন্যায়ের মূলোৎপাটন করা যায়। রাষ্ট্রীয় প্রভাবে সমাজে খুব সহজেই শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। কিন্তু রাষ্ট্র যদি তার বিপরীত হয়, তাহলে সে সমাজ অন্যায়, যুলুম, অত্যাচার, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনায় ভরে ওঠে। এ রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিবর্তন করার জন্য নবী-রাসূল তাদের সমকালীন রাজা-বাদশাহাদের শত্রুতে পরিণত হন।

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় নি। তিনি বিরুদ্ধবাদীদের চুড়ান্ত মোকাবিলা করেছেন ইসলামী কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মাত্র দশ বছরের শাসনামলে তিনি মদীনা ও পার্শবর্তী এলাকাসহ বহিঃর্বিশ্বে ইসলামের জাগরণ সৃষ্টি করেন। বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট লোক মারফত চিঠির মাধ্যমে দা‘ওয়াত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। বহিঃর্বিশ্বে বিভিন্ন প্রতিনিধি প্রেরণ করলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রপ্রধান ও গোত্রপতিদের দা‘ওয়াত দানের টার্গেট নির্ধারণ করেন। কারণ কোনো জাতির রাষ্ট্রপ্রধান যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সে জাতির লোকের খুব সহজেই ইসলামের ছায়াতলে ভীড়

জমাবে।" কেননা, প্রজাগণ তাদের রাজাদের অনুসারী হয়ে থাকে। শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হওয়ার কারণেই সূদুর বহিঃর্বিশ্ব পর্যন্ত ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।